চকচকে সিলিকা বালু আর নীলাভ হাওলা নদী

চারদিকে শুধু বালু আর বালু, দেখে মনে হয় যেন এক বিশাল মরুভূমি। ঝকঝকে বাদামি রঙের এ বালু হাতে নিয়ে গণনা করা যাবে। এগুলো দিয়ে তৈরি হয় মূল্যবান কাচ। দূর থেকে সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে বালু। মনে হয় অসংখ্য আলো নদীর পানিতে ভাসছে। একদিকে মেঘালয় পাহাড় আর তার পাশঘেঁষে গড়ে উঠেছে সিলিকা বালুর পাহাড়। সিলিকা বালুর সৌন্দর্য আরো মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট একটি নদী। নদীটির নীল রঙের পানি সিলিকা বালুর সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলেমিশে যেন একাকার।

নদীতে অনেকগুলো ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা। দেখে মনে হবে নদীর বুকে ভেসে বেড়ানো ডিঙ্গি নৌকায় মাছ ধরা হচ্ছে। কিন্তু এখানে নৌকার গলুইয়ে রুপালি চিকচিকে মাছের বদলে জমা হয় পাথর। স্থানীয় লোকজন একে পাথর বললেও আসলে এগুলো নুড়ি। তাদের নুড়ি কুড়াবার দৃশ্যটা বেশ চমৎকার। কোনো জাল নেই, ছোট ছোট টুকরি (স্থানীয় ভাষায় 'ওড়া' বলা হয়) নিয়ে নদীতে ডুব দিয়ে টুকরি ভরে অসংখ্য ছোট-বড় পাথর সংগ্রহ করা হয়। এসব পাথর নৌকা বোঝাই করে পাড়ে আনা হয়। সেখান থেকে ইঞ্জিনচালিত বড় বড় নৌকায় করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চালান হয়। বিক্রির জন্য নুড়ি যেখানে এনে জমা করা হয় তার অপর পাড়েই কয়লাখনি।

এই দর্শনীয় স্থানটি পড়েছে সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্ভপুর থানার বরছড়া এলাকায়। শহর থেকে সিলিকা বালুতে পৌঁছাতে সময় লাগবে ২ ঘন্টা। বিশম্ভপুর, বরছড়া কয়লাখনির কাছে যেতে পথেই দেখা যায় অন্য রকম সৌন্দর্যের এই সিলিকা বালু। এখানে আসতে হলে সুনামগঞ্জ শহর থেকে হাওলা নদী পার হয়ে চাপতে হবে মোটর বাইকে।

এ এলাকার একটা প্রবাদ আছে, '৬ মাস নাইয়ে, ৬ মাস হেঁটে'। এখানে আসার ভ্রমণ পথটা বেশ মজার। তার কারণ হলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা দিয়ে নদী পার হওয়া এবং নদীপথে অসংখ্য ছোট-বড় ট্রলার ও স্টিমার চোখে পড়ে। নদী অতিক্রম করার পর দেখা যাবে অসংখ্য মোটর সাইকেল। মনে হবে যেন বিশাল বড় মটর সাইকেলের বাজার। আসলে তা নয়, এগুলো মানুষ

যাতায়াতের কাজে ভাড়ায় চলে। চিকন উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তা বলে এখানে হোন্ডা ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন নেই বললেই চলে। দক্ষ হোন্ডা ড্রাইভারের পেছনে বসে উঁচু-নিচু পথ অতিক্রম করে গাড়ি কখন যে সিলিকা বালু এসে পৌঁছায় তা টের পাওয়া যায় না।

লেখা ও ছবি: **সারোয়ার জাহান জীবন**

যুবক ফোন
জনগণের ফোন